নাজাফে অগ্ন্যুৎপাত

লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে নাজাফ পবিত্র নগরী। এখানে রয়েছে চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর (রাঃ) মাজার। শহরটিকে কবরের নগরীও বলা যায়। কেননা, ইমাম আলীর মাজারকে ঘিরে যতদূর চোখ যায়, কবর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়বে না।

ইমাম আলীর মাজার এবং এই সহস্রাধিক কবরকে ঘিরে সপ্তাহকাল ধরে চলছে ঘোরতর লড়াই। একদিকে মুকতাদা আল সদরের মাহদি আর্মির মিলিশিয়া, অন্যদিকে মার্কিন দখলদার বাহিনী এবং তাদের দোসর নবগঠিত ইরাকি পুলিশ। বোমারু বিমান, হেলিকপ্টার গানশিপ, ট্যাঙ্ক, কামানসহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বাত্মক হামলা চালাচ্ছে মার্কিন বাহিনী। লক্ষ্য আল সদর বাহিনীর সমূলে বিনাশ। সর্বশেষ খবর, মার্কিন বোমায় গুরুতর আহত তরুণ শিয়া নেতা মুকতাদা আল সদর।

নাজাফ অগ্নিগর্ভ একদিনে নয়। এপ্রিলে আরেক দফা অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল। ইরাকি 'বিদ্রোহীদের' উসকানি দেয়ার অপরাধে মুকতাদা সদরের পত্রিকা বন্ধ করেছিল মার্কিন বাহিনী। প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ, বিক্ষোভে মার্কিন গুলি এবং গেরিলা যুদ্ধের সূত্রপাত। সে সময় মুকতাদাকে আত্মসমর্পণের আলটিমেটাম দেয়া হয়েছিল। তাকে ধরতে বাড়ি বাড়ি

প্রোফাইল

মুকতাদা আল সদর

সাদ্দামের অপসারণের পর ইরাকে যে নতুন নেতা পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে ব্যাপকভাবে, তিনি তরুণ শিয়া নেতা মুকতাদা আল সদর। ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ডাক দিয়ে যিনি এখন ইরাকের শিয়া-সুন্নি সব মানুষের গণবিদ্রোহের প্রতীক। বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে একজন নেতার উত্থান।

মুকতাদার পিতা মুহাম্মদ সাদিক সদর ছিলেন ইরাকের প্রখ্যাত শিয়া ধর্মীয় নেতা। ১৯৯৯ সালে সাদ্দামের এজেন্টরা তাকে হত্যা করে। মুকতাদার পিতা সাদিক সদরের নামেই বাগদাদের বিশাল শিয়াবস্তি 'সদর সিটি'র নামকরণ করা হয়েছে। গত বছর মার্চে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের সময় মুকতাদা সদরের নাম তেমন শোনা যায়নি। যুদ্ধ শেষ হবার পর জুন মাসে মুকতাদা সদর গঠন করেন মাহদি আর্মি। প্রথম দিকে এই আর্মির সদস্যরা নাজাফ এবং সদর সিটির রাস্তায় রাস্তায় টহল দিত। এ বছর মার্চে মার্কিন বাহিনী মুকতাদার 'আল-হাওজাহ' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দিলে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে মুকতাদার অনুসারীরা। সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র আকার নেয় এবং এপ্রিলের মাঝামাঝিতে মার্কিন বাহিনী মুকতাদার সঙ্গে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি করে।

৩০ বছর বয়সী অপেক্ষাকৃত এই নেতা তরুণদের মাঝে যথেষ্ট জনপ্রিয়। অনেকে মনে করেন, মুকতাদা ইরাকের রাজনীতিতে ক্ষমতার ভাগ নিতে আগ্রহী। এজন্যই তিনি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এমনিতেই মুকতাদা সদর ইরাকের শিয়াদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় এবং যেকোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি লাভবান হবেন।

তল্লাসি এবং এক পর্যায়ে ইমাম আলীর মাজারে গুলিবর্ষণের ঘটনাও ঘটে। অচিরেই দখলদার বাহিনী টের পায় মুকতাদার জনপ্রিয়তা এবং শক্তি। কাজেই শান্তিচুক্তির প্রস্তাব এবং নাজাফ থেকে পিঠটান।

সেই অস্ত্রবিরতি ভেঙে গেছে সপ্তাহখানেক আগে। ভেঙেছে দখলদার বাহিনী। এপ্রিলের পর যুদ্ধবিরতির সময়টুকু তারা কাজে লাগিয়েছে। তথাকথিত ইরাকি প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। সাদ্দাম হোসেনকে কাঠগড়ায় হাজির করেছে। ইরাকজুড়ে গোয়েন্দা কার্যক্রমও জোরদার করেছে। ফলে পরিস্থিতি এখন অনেকখানি মার্কিন বাহিনীর অনুকূলে। একমাত্র সমস্যা বিদেশীদের অপহরণ এবং হত্যার হুমকি। গেরিলাদের অব্যাহত অপহরণ ঘটনায় বিব্রত মার্কিন প্রশাসন। এর সঙ্গে শিয়া গেরিলাদের যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে পেন্টাগন। অতএব, মুকতাদার হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে নাজাফের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এক সপ্তাহের বেশি যুদ্ধের পরও নাজাফের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে মাহদি আর্মি।

নাজাফ স্ট্র্যাটেজি

পশ্চিমা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইরাকি প্রশাসন অর্থাৎ আলাবি সরকারের জন্য নাজাফ একটি টেস্টকেস। এখানে সাফল্য-ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করছে তাদের পথচলা। কিন্তু অধিকাংশ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক তেমনটা মনে করেন না। প্রথমত, সরকারের কার্যক্রমের শুরুতেই আলাবি মাহদি আর্মির সঙ্গে সরাসরি সশস্ত্র বিরোধে কেন জড়াতে চাইবেন সে কথা পরিষ্কার নয়। আলাবি সময় নেবেন, নিরাপত্তা বাহিনীকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেবেন। মুকতাদার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসকে পর্যবেক্ষণ করবেন- এরপর পদক্ষেপ। বলা বাহুল্য, জুনের শেষভাগে ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর আলাবি সদরের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনায় বসেননি। তাই অনুমান করা সহজ, প্রথম চোটেই গোলাবারুদ নিয়ে তিনি মাঠে নামবেন না। দ্বিতীয়ত, মুকতাদা আল সদরের সঙ্গে শত্রুতা দখলদার বাহিনীর। দোসর হিসেবে আলাবি তাদের টার্গেট হতে পারেন। কিন্তু মুকতাদা এখন পর্যন্ত ইরাকি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং নাজাফের গভর্নর এবং আলাবির ক্যাবিনেটের অনেকেই মুকতাদার প্রতি দুর্বল।

এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে সম্ভাবনার কথা বলা যায় তা হলো, মুকতাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধটা মার্কিন স্বার্থে। নাজাফ পবিত্র নগরী। এপ্রিলে এককভাবে যুদ্ধ করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ

আমেরিকার স্বপ্নে বিভোর রাশিয়ার তুর্কি

একদিন জীবন বাঁচাতে তারা পালিয়ে এসেছিল রাশিয়ায়। আজকে আবার জীবন বাঁচাতে রাশিয়া ছাড়তে হচ্ছে। এবার গন্তব্য আমেরিকা। বলছি রাশিয়ার তুর্কিদের কথা।

দিলাবের করিমভের পরিবারের কথাই ধরুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ১৯৪৪ সালে সোভিয়েট একনায়ক জোসেফ স্টালিনের আদেশে জর্জিয়া থেকে উজবেক শহর ফারগানায় স্থানান্তর করা হয় করিমভের পিতামহদের। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে গেলে পুনরায় ফারগানা থেকে পালাতে হয় করিমভদের। এবার তারা বসতি করেন দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রাসনোদার অঞ্চলে। ছয় দশকে তিনবার স্থান বদল। এবার আরো একবার স্থান বদলাতে হচ্ছে করিমভদের।

কিন্তু কেন? রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে জাতিগত মেস্কেশিয়ান তুর্কিরা বসবাস করছে সেই ওসমানীয় সালতানাতের আমল থেকে। সোভিয়েট ইউনিয়নে বলশেভিক বিপ্লবের পর ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে নিষ্পেষণের শিকার হতে এই জাতিগত তুর্কিদের। বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর করা হয় তাদের। সর্বশেষ স্থানান্তর ঘটে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর। এ সময় প্রাণ বাঁচাতে তুর্কিরা সমবেত হয় ক্রাসনোদার অঞ্চলে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী, রাশিয়ার তুর্কিদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা নেই। আইনগত ঝামেলায় বছরের পর বছর ঝুলে আছে তাদের মর্যাদার ব্যাপারটি। সোভিয়েট আমলে বসবাসের অনুমতিপত্র এখন অকেজো। এরপর কোনো তুর্কিই 'রেজিস্ট্রেশন' করতে পারবে না। রাশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র না থাকলে কেউ রাশিয়ান হাসপাতালে ভর্তি, পেনশন কিংবা কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে না। এমনকি তুর্কিরা মাঠে যে ফসল চাষ করে তাও অবৈধ। এই ফসল বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে রাশিয়ার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জরিমানা দেয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটছে। তিনজনে একজন তুর্কির পক্ষে রাশিয়ার পাসপোর্ট পাওয়া সম্ভব।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (আইওএম) এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এই তুর্কিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়েছে। ব্যবস্থা অনুযায়ী, এদের নিয়ে যাওয়া হবে আমেরিকায়। আমেরিকার স্বপ্নে বিভোর তুর্কিরা এখন জমিজমা বিক্রি করে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

করিমভদের পরিবারে এখন সেই প্রস্তুতি চলছে। জমিজমা, বসতভিটা সবই বিক্রি করে দেয়া হয়েছে নামমাত্র মূল্যে। করিমভ তবুও ভাগ্যবান। দাম পেয়েছে। অনেকের পক্ষে তাও জুটছে না। কেননা প্রতিবেশী রাশিয়ানরা তক্কে তক্কে আছে কখন তুর্কিরা ভিটা ছাড়বে আর তা দখল করে নেবে। করিমভ এবং তার তিন সন্তান এখন ইংরেজি গ্রামার চর্চায় ব্যস্ত। মাইগ্রেশন সংস্থা ক্রাসনোদার অঞ্চলে একটি স্কুল খুলেছে যেখানে মুভি, বইপত্র এমনকি ভিডিও গেমসের মাধ্যমে তুর্কিদের আমেরিকান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত করানো হচ্ছে। একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, চাইলেই হলিউডের সুপারস্টার হতে পারবে যে কেউ। রাশিয়ার তুর্কিরা এখন সেই রূপালী জগতের স্বপ্নে বিভোর।

মোস্তফা রাশেদ

হয়েছে। তাই এবার জড়ানো হচ্ছে ইরাকি বাহিনীকে। মার্কিন প্রশাসন ভালো করেই জানে, জীবিত মুকতাদা মার্কিন দখলদার বাহিনীর অবস্থানের প্রতি হুমকি। কাজেই তাকে সরিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে বোমা মেরে।

নাজাফ আসলে মার্কিন বাহিনীর জন্য টেস্ট কেস। এখানে ব্যর্থতা মানে সমগ্র ইরাকে ব্যর্থতা। ইতিমধ্যে নাজাফ স্টাইলে জেগে উঠেছে হিলা, সুন্নি শহর সামারা। এ ছাড়া জেগে রয়েছে ফাল্লুজা, তিররিত, বাগদাদ, বসরা। সর্বত্রই ব্যাপক বোমাবাজি এবং নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছে মার্কিন বাহিনী। বুশ প্রশাসনের চাপ রয়েছে পেন্টাগনের ওপর। নবেম্বরের আগেই সবকিছু ঠিকঠাক চাই। নইলে ভোটযুদ্ধে মার খেতে হবে।

মাহদি আর্মি

মুকতাদা সদরের বাহিনী কি জানে না সমরাস্ত্র প্রযুক্তির দিক থেকে তারা পিছিয়ে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে? জানে, তারপরও মাহদি আর্মি জীবনপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। ত্রাণকর্তা হিসেবে ইমাম মাহদির আগমনের ধর্মীয় দর্শনে বিশ্বাসী এই মিলিশিয়ারা মনে করে, কাফিরদের হত্যার মাধ্যমে তারা ইমাম

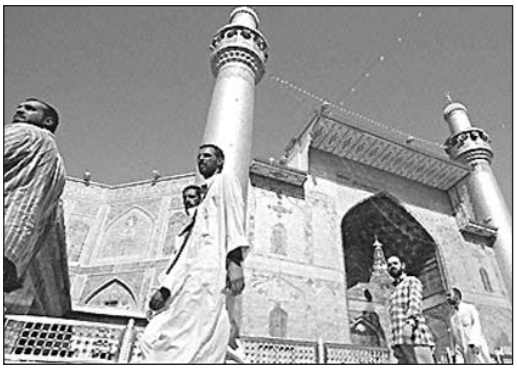

মাহদি আগমনের পথ পরিষ্কার করছে। আদর্শে উজ্জীবিত মানুষকে সামাল দেয়া কঠিন। এই কঠিন কাজটিই করতে হচ্ছে মার্কিন বাহিনীকে।

২০০৩ সালে তরুণ শিয়া নেতা মুকতাদা আল সদরের নেতৃত্বে গঠিত হয় এই বাহিনী। দলে দলে শিয়া তরুণরা যোগ দেয় এতে। শিয়া সম্প্রদায়ের তরুণদের মধ্যে আল সদরের এতোটাই জনপ্রিয়তা যে, কাশেম রিসাম নামে এক যোদ্ধা পশ্চিমা প্রেসকে বলেছে, সে জানে না মাহদি আর্মির উদ্দেশ্য কি। তবে সে সদরের নির্দেশ মেনে জীবন দিতে প্রস্তুত। হালকা অস্ত্রের সহজলভ্যতার কারণে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মাহদি আর্মির। দলটির সদস্য সংখ্যা আনুমানিক ১০ হাজার। এদের হাতে রকেট-চালিত গ্রেনেড, কলাশনিকভ রাইফেল এবং ভারী মেশিনগান রয়েছে। নাজাফ মাহদি আর্মির শক্তির কেন্দ্র। এর একটা কারণ, কোনো কারণে যদি বিধর্মী বাহিনী পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে তাহলে ফুঁসে উঠবে গোটা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা, এটা মুকতাদা সদরের প্লাস পয়েন্ট।

কিন্তু মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে এই প্লাস পয়েন্ট কতটা কাজে আসবে বলা মুশকিল। প্রথমত, এটি এমন এক প্রতিপক্ষ যারা অন্য ধর্মমতের প্রতি বিন্দুমাত্র সহনশীল নয়। দ্বিতীয়ত, এখন নাজাফে যা ঘটছে তা স্রেফ গণহত্যা। মিলিশিয়া হত্যার নামে নারী-শিশু নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ফাল্লুজার গণজাগরণও ঠিক একই কায়দায় দমন করা হয়েছিল। প্রায় হাজারখানেক বেসামরিক ব্যক্তি হত্যার মধ্য দিয়ে। নাজাফেও হয়তো একই পরিণতি অপেক্ষা করছে। তবুও নাজাফের এই গণজাগরণ ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্বকে ক্রমশ দুরূহ করে তুলবে, তা বলাই বাহুল্য। এখানেই মুকতাদার মতো বিপ্লবীদের সাফল্য।